*জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস*
**ভলিউম-১০, সংখ্যা-২, জুলাই–ডিসেম্বর ২০২০**

# অন্তহীন বৃত্তান্তে জীবন : দেবেশ রায়ের *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*

মুনিরা সুলতানা*

**Abstract**

Debesh Roy (1936-2020) has established himself as an unrivalled narrator in modern Bengali novel. He is also an intent reader and analyzer of the creation of novel as well as novelization of life, history and time. His conscientious study about the development and formation of Bengali novel is also very notable for the theorization of neo aspect of Bengali novel. Roy`s artistic endeavors especially the geography of narrative continues with an idiosyncratic characteristics. He is best known for his Shahitya Akademi award-winning novel *Teestaparer Brittanto* (1990), which is a distinguished novel for its narrative exception from traditional Bengali novel. In this article there is an overview of *Teestaparer Brittanto*, in which the author depicts the chronic irrelevance, disharmony and estrangement of an individual from socio-economic, political structure and the colonization of capitalistic economy. The object of this article is to highlight also the novelistic form or pattern of Debesh Roy in which he is accustomed as a storyteller.

পরিবেশ ও পটভূমির ব্যাপ্তি এবং এই দুয়ের অঙ্গাঙ্গিতায় মানবচরিত্রের জটিল রহস্যের বিকাশ ও উন্মোচনেই উপন্যাস সার্থক হয়ে ওঠে। ব্যাপ্তির যে ধারণা উপন্যাসের গঠনের সাথে সম্পর্কিত; সেই আদি ধারণা থেকেই ঔপন্যাসিক দেবেশ রায়ের (১৯৩৬-২০২০) 'বৃত্তান্ত' রচনার প্রচেষ্টা। বৃত্তান্ত কখনো থেমে যাবার নয়– এই শিল্পধারণা দেবেশ রায় তাঁর একাধিক উপন্যাসে প্রকাশ করেছেন। বৃত্তান্ত– যার আদি নেই, অন্ত নেই। বৃত্তান্ত কবে শুরু হয়েছে তা যেমন বলা যায় না, কবে শেষ হবে তাও অনিশ্চিত। অনিঃশেষ এর বিস্তার, জীবনের মতো। "দেবেশের উপন্যাসেও সেই চলমানতার রূপই ক্রমশ শিল্পের মাহাত্ম্য অর্জন করেছে। যেখানে জমি বাড়তে থাকে, চেনা-অচেনা অসংখ্য চরিত্র যাওয়া-আসা করে, দেশ ও কাল নির্ভর প্রসঙ্গের অভ্যন্তরে– আসে নতুন-নতুন রহস্য, প্রতিনিয়ত বিচ্ছিন্নতা ও সংলগ্নতা ঘটতে থাকে পরস্পরের মধ্যে– এই নিয়েই তাঁর মহাকাব্য, এই নিয়েই তাঁর বৃত্তান্ত।"[১]

ইংরেজি Chronicle-কে বাংলায় 'সময়ানুক্রমে সংঘটিত ধারাবাহিক ঘটনার বিবরণ' বলা চলে। শব্দটির সাহিত্যিক সংজ্ঞার্থে বলা হয়েছে :

> A Chronicle is a historical account of events (real or imagined) that are told in chronological order, meaning from first to last as they occur in time. It typically records events as witnessed or understood by the person writing the chronicle (the chronicler); but it is fundamentally objective, not interpretive. It is used as a style of writing in both fiction and nonfiction. In modern time, various fictional stories have also adopted "chronicle" as part of their title, to give an impression of epic proportion to their stories.[২]

সাহিত্যিক পরিভাষা হিসেবে Chronicle মূলত ইতিহাস রচনার সাথে সম্পর্কিত।[৩] যেমন– নবম শতকে ইংল্যান্ডের (Wessex) রাজা আলফ্রেডের (৮৪৯-৮৯৯) সময় থেকে রচিত হতে থাকে 'Anglo-Saxon Chronicle', যা বিশ শতক পর্যন্ত চলেছিল। এটা ছিল ইংরেজদের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক অর্জনের মাইলফলক; ইরেজি গদ্যের রূপ-রূপান্তরের একটা গুরুত্ববহ সংগ্রহও ছিল এটি। আধুনিক ইতিহাস কিংবা সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে যেকোনো Chronicle পূর্বগামীর কাজ করে, কারণ এতে গদ্যে

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বা পদ্যে লিখিত প্রচুর উপাদান থাকে; বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ ধরনের রচনাগুলো লৌকিক উপকাহিনীর মত হলেও এগুলো বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত থেকে খুব একটা আলাদা নয়। অর্থাৎ তথ্য ও সময়-প্রতিফলিত সত্যই অন্তর্ভুক্ত হয় এতে। উদাহরণ হিসেবে ইংরেজ 'ক্রনিকলার' Raphael Holinshed (১৫২৯-১৫৮০)-এর Chronicles of England, Scotland And Ireland (YEARE 1577 to the YEARE 1586) কথা বলা যায়– ১৮০৮ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত ছয় খণ্ডের এই ডকুমেন্টটি পরবর্তীকালে শেক্সপিয়ারের (১৫৬৪-১৬১৬) বিভিন্ন 'Chronicle Play' এবং অন্যান্য এলিজাবেথীয় নাট্যকারদের রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-উৎস হিসেবে কাজ করেছে। 'Chronicle Novel' বলেও একটি সাহিত্যিক পরিভাষা রয়েছে। এ সম্পর্কে 'The Oxford Dictionary of Literary Terms'- এ বলা হয়েছে :

> A long novel or connected sequences of novels in which the narrative recounts the fortunes of a family or similar group recurring Characters over many years, usually covering at least two generations. This category of fiction overlaps with the saga novel, where the emphasis is on changes within a family; but where the story attempts to reflect typical development in social history over a sustained period, the term 'chronicle novel' may be preferred, especially if the story's events are connected with notably historic dates and events. Significant modern examples in English- John Galsworthy's *The Foresyte Saga*, 1906-1921.[৪]

দেবেশ রায়ের বৃত্তান্ত সমালোচনায় এগুলো প্রাসঙ্গিক হলেও তাঁর রচিত বৃত্তান্তগুলোর একটাও 'Chronicle' নয়। অর্থাৎ তাঁর উপন্যাসগুলোকে সেই সংজ্ঞার্থের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তবে 'Chronicle'-এ সময়কে যেভাবে পর্বান্তরে ধারণ করা হয়, দেবেশের উপন্যাসে সেরকম প্রক্রিয়া লক্ষণীয়; যেখানে সময়ের ঐতিহাসিকতা বা 'ইভেন্ট' থাকে– ঔপন্যাসিকের 'ফিকশন'-এ সেই 'ইভেন্ট' বা সময়ের ভেতর 'উপন্যাসন' ঘটে যায়। এই অর্থেই উপন্যাস হয়ে ওঠে বিস্তৃত-বিস্তীর্ণ সময়ের আধার।

উপন্যাসের নামে 'বৃত্তান্ত' শব্দ যোগ কোনো বিশেষ 'ফর্ম' সৃষ্টির প্রয়াস কী না সে অনুসন্ধানকে নাকচ করে দেবেশ রায় বলেন : "*পুতুল নাচের ইতিকথা*, *হাঁসুলিবাঁকের উপকথা*, *ঢোঁড়াইচরিতমানস* ইত্যাদি উপন্যাসেও এই ধরনের নাম বা শব্দ যোগ হয়েছে। তাই আমার 'আখ্যান-বৃত্তান্ত-পুরাণ' ইত্যাদি শব্দকে নতুন ধরার কোনো কারণ নেই।"[৫] তবে আধুনিক শিল্পপ্রকরণ হিসেবে উপন্যাসের জন্য নতুন তত্ত্ব রচনার যে তাগিদ তিনি অনুভব করেছেন তা তাঁর বৃত্তান্ত রচনার সাথেও সম্পৃক্ত। "(উপন্যাসের) নতুন তত্ত্ব ভাবা ও তৈরি করা এক নিরবধি লড়াই বা চলমান প্রক্রিয়া"[৬] দেবেশের এ বক্তব্যও তাঁর উপন্যাস-চর্চার ভঙ্গিমাকে ব্যাখ্যা করে; 'বৃত্তান্ত' এই প্রক্রিয়ায়ই প্রকাশ। দেবেশ রায়ের কাছে উপন্যাস সীমায়িত শিল্পপ্রকরণ নয়, যেখানে রয়েছে রাষ্ট্র-রাজনীতি-সমাজ-অর্থনীতি-ইতিহাস তথা সামূহিক মানবজীবনচিত্র কিংবা সে সম্পর্কে শিল্পীর বীক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও নিরন্তর পাঠ। বৃত্তান্ত রচনায় দেবেশের চিন্তনে কাজ করে এক অখণ্ড সময়ের অনুভব– পরিবাহিত ও অনিঃশেষ সেই সময় ও অন্তহীন চলমান জীবনকেই তাঁর সম্মুখপ্রসারী (open-ended) 'বৃত্তান্তে' ধরতে চেষ্টা করেন তিনি; একইসাথে বৃত্তান্ত রচনার অসম্পূর্ণতা প্রকারান্তরে অপারগতাকে স্বীকার করেন। এটা তার উপন্যাস-শিল্প দর্শন ভাবনাও। এছাড়া তাঁর মতে :

> উপন্যাস এমন একটা শিল্পরূপ, যেখানে প্রত্যেকটা উপন্যাস উপন্যাসের নতুন ফর্ম তৈরি করে; ... ঔপন্যাসিক যেভাবে তাঁর ন্যারেটিভকে ধরেন, তার ওপরেই এ উপন্যাসের ফর্মটা আকার নেয়। আর সেই আকারটাই হল উপন্যাস। উপন্যাসের আয়তনের কারণে এই ফর্মটা ভীষণ determining; আকার যেটা নিচ্ছে, সেই আকারটাই হল বিষয়।[৭]

মধ্যযুগের বর্ণনাধর্মী আঙ্গিক বা 'ন্যারেটিভ প্যাটার্ন' বিশেষত মঙ্গলকাব্য, পাঁচালি, লোককাব্য, কিচ্ছা-কাহিনীর ভিতরে থাকা গল্প বর্ণনার ভঙ্গিমাটা বৃত্তান্তকার দেবেশের অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস। তার

আখ্যান বিশেষত *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* ও *সময় অসময়ের বৃত্তান্ত* উপন্যাসে "আগাগোড়া চলেছে একটা সন্দর্ভ– Narrative আর Discourse মিলেই তৈরি হচ্ছে টানাপোড়েন।"[৮] দেবেশের বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে সমালোচকের মত :

> বৃত্তান্তকার, বৃত্তান্ত বা ক্রনিকল যিনি লেখেন– প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাহিত্য ও পুরাণের ঐতিহ্য থেকে জেনেছি– শুধু যা ঘটেছে তার কথা বলেন না, বলেন যা ঘটবে তার কথাও। দেবেশ তাঁর বৃত্তান্তে সেই দ্রষ্টা বা ব্যাখ্যাতার ভূমিকাকেই ক্রমশ স্পষ্ট করেছেন। দেশ ও কালকে উন্মোচিত করার লক্ষ্য, চরিত্রের ব্যক্তিগতকে নৈর্ব্যক্তিকে মেলানো এবং তারই সঙ্গে বৃত্তান্তকারের আয়োজিত সংগঠন ও স্বপ্ন– এসবের মধ্যেই উপন্যাসের সংজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠা বা পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছেন দেবেশ।[৯]

ছেদহীন পর্ব-পর্বান্তরের সমন্বয়ে অন্তত তিনটি বৃত্তান্ত লিখেছেন দেবেশ রায়। এগুলো হল– *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* (১৯৮৮), *মফস্বলি বৃত্তান্ত* (১৯৮৯)এবং *সময় অসময়ের বৃত্তান্ত* (১৯৯৩)। *আত্মীয় বৃত্তান্ত* (১৯৯০) 'বৃত্তান্ত' নামধারী হলেও পূর্বোক্ত তিনটি উপন্যাস থেকে এটি সম্পূর্ণ আলাদা।

বাংলা উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* একটি স্বতন্ত্র উপন্যাস। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে, উপন্যাসটির আদিপর্ব ও বনপর্বের প্রথম প্রকাশ ১৯৮০ ও ৮১-র শারদীয় 'বারমাসে'-এ এবং অন্ত্যপর্ব প্রকাশ পায় ১৯৮৭-র শারদীয় 'প্রতিক্ষণ'-এ। উপন্যাসটির জন্ম আশির দশকে এবং এতে রয়েছে সমকালীন জীবন, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আবর্তন যা একইসঙ্গে সাময়িক এবং উত্তরিত বা সর্বকালীন জীবন-বিধৃত। উপন্যাসের শুরু উত্তরবঙ্গে আপলচাঁদ ফরেস্টের কাছাকাছি এক অতি নির্দিষ্ট স্থানে। এর প্রস্তুতি পর্বের স্মৃতিচারণে সমালোচক লিখেছেন :

> 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'– সূচনাকাল সম্ভবত ১৯৬৩-৬৫ সাল। সে সময় দেবেশদা পার্টির কাজের দায়িত্ব নিয়ে প্রায় সর্বক্ষণের কর্মীর মতোই তিস্তাপারের উভয় তীরের ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করে বসবাসকারী সাধারণ কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষদের ভেতরে প্রবেশ করে তাঁদের জীবনযুদ্ধের প্রাত্যহিক ঘটনাগুলি তাঁর মানসপটে চিত্রায়িত করতে থাকেন। তারই ফলশ্রুতি তাঁর মহাকাব্যোপম উপন্যাস 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'। তিস্তাপারের সমাজ-সংস্কৃতির এমন বাস্তব চিত্র দুর্লভ।[১০]

গল্প-উপন্যাসে তিস্তা প্রসঙ্গে দেবেশ রায়ের স্মৃতিচারণ :

> তিস্তা নিয়ে তো বেশ কিছু গল্প উপন্যাস লিখেছি। খুব সম্ভবত, 'বিপজ্জনক ঘাট...' নামে একটি গল্পই তিস্তা নিয়ে আদি লেখা। খুব টানত– তিস্তার বিস্তার, চর আর স্রোত। সেই স্রোত পেরনোর শক্তি, যৌবন ও দক্ষতা। এই টানটার ভিতর রোম্যান্স ছিল। রোম্যান্স ছাড়া তো আর কোনো গল্পই গল্প হয় না।[১১]

*তিস্তাপারের বৃত্তান্তে* প্রায় সাড়ে আটশ পাতা ধরে রচিত হয়েছে বাঘারুর আখ্যান। তেমনি পাঠককে লেখক জানাতে ভোলেননি যে, বাঘারুর গল্প বলতে চাওয়া তার পক্ষে কত অসংগত, কত অবান্তর। "লেখক হিসাবে তাঁর অবস্থান *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* লিখবার আগেও যেখানে ছিল, এ বৃত্তান্ত শেষ করেও যে তিনি সেই একই জায়গায় থেকে গেলেন, এমন চৈতন্যের যন্ত্রণা দেবেশ রায়কে ছেড়ে যায় না কখনও।"[১২] বাঘারুর চরিত্রায়ণ এবং সে ব্যাপারে লেখকের স্বীকৃত অপারগতা প্রসঙ্গেই সমালোচক এই মন্তব্য করেছেন। উপন্যাসের শুরুতে বা 'আদিপর্বের' চৌদ্দতম উপ-পরিচ্ছেদে এক উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পটভূমিতে 'ফরেস্টারচন্দ্রের আত্মঘোষণা'য় বাঘারুর নিজস্ব স্বরে তার পরিচয় উন্মোচন করেন কথক। "গায়ে অন্ধকারের এক পুরু পলেস্তারা লাগিয়ে" অন্ধকারে দৈত্যাকার ছায়া বাঘারু, জমির হাকিমকে (সার্ভে অফিসার) কাল্পনিক দাঁড় করিয়ে আত্মগত আওয়াজে সে নিজের পরিচয় দেয়:

> হুজুর আসি গেইছি। মুই ফরেস্টারচন্দ্র। ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মন। দেখি নেন। মোর মুখখান, দেহখান, দেহি নেন।[১৩] দুই হাতের পাতায় চোখ ঢেকে, ফরেস্টার অন্ধকারকে আরো অন্ধকার করছিল। নীরবতা তৈরি হচ্ছিল। সে-নীরবতায় তার কথাবার্তাগুলোও মিলিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে সেই

> নীরবতার ভেতরে থেকে ফরেস্টার শুরু করে, "শুন হে হুজুর, কাথা মোর দুইখান। কী দুইখান কাথা? একখান কাথা হইল যে তোমরা ত জমির হাকিম। মোর জমিঠে মোর নামখান তুমি কাটি দাও। মোর একখান ত জমি আছিল। আপলচাঁদ ফরেস্টের গা-লোগো। মোক ঐঠে পাঠায় গয়ানাথ জোতদার। হাল-বলদ-বিছন সগায় ওর। মুই হালুয়া আছিল কয়েক বছর। অ্যালায় আর নাই। বলদ যার, বিছন যার, হালুয়া যার, ধান যার- জমি ত তারই হবা নাগে হুজুর। ত ঐ জমিখান মুই, ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মন ছাড়ি দিছু। লিখি দাও, শ্রীফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মনক এই জমিঠে উচ্ছেদ দেয়া গে-এ-এ-ই-ল্।[১৪]

বাঘারুর উন্মোচনে কথক এভাবেই সংলাপ বা কথোপকথনের সাহায্য নেন। যদিও সমগ্র উপন্যাসে বাঘারু একসাথে এত কথা আর একবারও বলেনি। জমির সার্ভেয়ার বা তার ভাষায় হাকিমকে সে আরো জানিয়ে দিতে চায়, "এইঠে ফরেস্টার ত অনেক হুজুর– বর্মণও হুজুর অনেক। রায়বর্মণও কনেক-আধেক আছে। কিন্তুক বাঘারুবর্মণ এই একোটাই।"[১৫] চেহারায় অনড় দৃঢ় মোঙ্গলীয় স্থাপত্যের খোদাই নিয়ে ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মণ জানিয়ে যায় আপলচাঁদ ফরেস্টের কাছে তার একখানা জমি ছিল, কী করে তা গয়ানাথ জোতদার দখল করে তাকে 'হালুয়া' বানিয়েছে, কী করে তার নাম বাঘারু হল। অবশ্য জমির হাকিমের সাথে এই কাল্পনিক কথোপকথনের সাক্ষী থাকে কেবল অন্ধকার এক প্রকৃতি।

অপারেশন বর্গার কাজে তিস্তাপারে আসা সেটেলমেন্টের অফিসার সুহাস, যে এককালে ছিল নকশাল, এখন সরকারি আমলা, পুরোমাত্রায় সৎ এবং বর্গাজরিপের কাজ নিষ্ঠার সাথে পালন করতে বদ্ধপরিকর, গাজোলডোবা গ্রামে সে পৌঁছে যায় সার্ভের কাজে। বৃত্তান্তের শুরুতে সার্ভে অফিসার সুহাসের প্রেক্ষণবিন্দুতে দেখা যায় বাঘারুকে। সুহাস লক্ষ করে, গয়ানাথ জোতদারের সমস্ত হুকুম একটা লোক নীরবে তামিল করে চলেছে– কখনো 'হাকিম'-এর বসবার জন্য মাথায় করে চেয়ার বয়ে আনছে, কখনো সেই চেয়ারের পায়া ক্রমাগত মুছছে, কখনো বড় ও ভারী মৌজা ম্যাপটা হাওয়ায় উড়ে গেলে তরতর করে গাছে উঠে পেড়ে আনছে। লোকটার পরনে এক চিলতে কাপড় ছাড়া আর কিছু নেই। সুহাস ভাবে, লোকটা কে? "জরিপবিদের তেমন কোনো ভাষা অধিগত নেই যার সাহায্যে লোকটাকে সে দ্ব্যর্থহীনভাবে চিনতে পারে, তেমন কোনো চিহ্নবিজ্ঞান আয়ত্তে নেই, যার সহায়তায় পুরোদস্তুর পড়ে বা পেড়ে ফেলতে পারে তাকে।"[১৬] সার্ভে অফিসার সুহাস আর কথকের জবানিতে একযোগে উপমায়িত হয় বাঘারু:

> সুহাসের দুই হাতে ম্যাপ মেলা– নীল কাগজের ওপর শাদা রেখার। আর এই লোকটিই যেন আর-একটা ম্যাপ রিলিফে আঁকা, এমন নিষ্প্রাণ বস্তুর মত সামনে এসে দাঁড়ায়। তার মাথা থেকে পা শাল-সেগুনের দীর্ঘ কাণ্ডের মত অনিয়মিত, বর্ণশূন্য ও রুক্ষ। চোখদুটো কোন গভীরে– মণি দেখা যায় না। নাকটা থ্যাবড়া। পরনে একটা নেংটি– তার রংও গায়ের রংয়ের সঙ্গে মিশে আছে।[১৭]

> ...সুহাসের একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায় লোকটা– পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত ভেজা, সারা গায়ে জল, পরণের কানিটা উরুর সঙ্গে লেপ্‌টে গেছে। লোকটা একটা ভেজা শালগাছের মত দাঁড়িয়ে থাকে– বানের জল নেমে যাওয়ার পর ডাঙা জমির একটা বিচ্ছিন্ন শালগাছের মত এই ভিড়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। তার পাশ কাটিয়ে ভিড়টাকে এগুতে হয়।[১৮]

উপন্যাসের বিভিন্ন অংশে শালপ্রাংশু বিশাল দেহ আর বুকের অধিকারী বাঘারু বর্ণিত হয় একই ভঙ্গির ঐকতানে:

> যদি বাঘারু ছোটখাট হত বা অন্তত একটু রোগা, ভিড়ের ভেতর দাঁড়ালেও যদি ওকে দেখা না যেত, যদি মিশে যেত ভিড়ের সঙ্গে, তা হলেও তাকে খেয়াল না করে থাকা যেত। কিন্তু এই বাঘারুটা ত একটা পুরনো শাল-গাছের মত তার শ্যাওলা-ছাতাধরা শরীরে সবাইকে আড়াল করেই তাকে দাঁড়াতে হয়। ...অথচ এত বড় একটা বাঘারু, তার শরীরের চামড়া গাছের বাকলের মত, মুখ-চোখে কোনো ভাষা নেই, মাথার চুলের আলাদা রং নেই। সত্যি এখানে চলে না। [১৯]

বাঘারুর অসংলগ্ন আর প্রচল বিশেষণহীন শরীরী অবয়বের মতই কিছুটা অনির্ধারিত এবং অমীমাংসিত থেকে যায় তার নামটাও। সে এম-এল-এ বীরেন্দ্রমোহন রায়বর্মণকে পথহীন ফরেস্ট, ব্রিজহীন নদী পার করে দিতে পারে। "এম-এল-এ দেখে, জঙ্গলটা যেন কোনো সময়ই বাঘারুর কোমর ছোঁয় না। সে যেন মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটছে, এমনি তার হাঁটা।"[২০] এম-এল-এ-র পথ-প্রদর্শক বাঘারু তার এ্যামেলিয়াবাবুকে বলেছিল, "যত টাইম যাছে, মোর নামখান সলসল করি বড় হয়্যা যাছে। ... তোমাক মোর নামটা ছোট করি দিবার নাগিবে। ...সগারই ত ছোট হয় বাবু, মোরখানই বাড়ি যাছে। ...হাজারিয়া কাম। হাজারিয়া নাম। কামও বদলি যাছে, নামখানও বাড়ি যাছে। এক কামের পরে আরেক কাম, এক নামের পরে আরেক নাম। মোর একখান মানষির নাম দেন।"[২১] এম-এল-এ-কে নদী পার করে দিতে দিতে বাঘারু শুনিয়ে যায় তার নামকরণের সাতকাহন। কী করে কাঠ কুড়ানো মায়ের পেটে জন্মালে সে হল 'কুড়ানিয়ার ছোয়া', একাকী আদিম প্রাকৃতিকতায় কাঠ কুড়ানো মা সদ্যোজাতের নাড়ি কাটতে পেল কেবল হাতের কুড়ুলখানা, তাই বাঘারুর নাম হল 'কুড়ালিয়া কোটা' আর গয়ানাথের জঙ্গলে (আপলচাঁদ ফরেস্ট) তাকে আক্রমণ করে বাঘ। ঘাড়ে, পেছনে বাঘের থাবার আঘাত পেয়েও বাঘের সাথে লড়াইয়ে জিতে গেলে তখন থেকে তার নাম হল 'বাঘারু, "সেইঠে মোর নাম হয়া গেইল বাঘারু। বাঘ খানক মুই হারি দেছু, এ্যাল্যায় মোর নাম হইল বাঘারু। ...এ ধরো কেনে, পুরা একখান পালাটিয়া গান বান্ধা হয়্যা গেইল– কুড়ানির ছোয়া, কুড়ালিয়া-কোটা, বাঘারুয়া, ফরেস্টুয়া চন্দ্র বর্মন।"[২২] এই 'পালাটিয়া গানের' মত বৃহৎ নামের সারি থেকে মুক্তি পেতে চাওয়া বাঘারুর এ্যামেলিয়া বাবুর কাছে আর্জি ছিল নামটা মানুষের নামের মত ছোট ও স্থির করে দিতে। একটা নাম তাকে গয়ানাথও দিয়েছে, যেন শ্লেষ মেশানো কণ্ঠেই বাঘারু বলে :

> গয়ানাথও ত মোক নাম দিছে বাবু। গয়ানাথ মোর মাও-এর দেউনিয়া, মোর দেউনিয়া, জমির দেউনিয়া, ফরেস্টের দেউনিয়া, তিস্তা নদীর দেউনিয়া, ভোটের দেউনিয়া। ত ধরো, এ্যানং একখান ভোটের আগত কহিল,হে বাউ, ভোটত তয় নামখান দিয়া দিছু।ত মুই পুছিলোঁ, কী মোর নামখান। ত কহিল, ফরেস্টারচন্দ্র বর্মন, মনত রাখিস ফরেস্টারচন্দ্র বর্মন। ত মুই মনত রাখি দিছু– ফরেস্টারচন্দ্র বর্মন। মনত রাখি ভোট দিছু– গয়ানাথের ভোট।[২৩]

বাঘের কামড়ে ছয়মাস জলপাইগুড়ির হাসপাতালে পড়ে থাকা বাঘারুর হাল আর চাষ দুই-ই চলে গিয়েছিল, প্রাপ্তি ছিল নামটা। গয়ানাথ জোতদার এম-এল-এ কে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বলদ বাঘারু' তাকে ঠিকমতো নদী পার করে দিয়েছিলো কি না, ততক্ষণে অবশ্য এ্যামেলিয়া বাবু কুড়ানির ছোয়া, কুড়ালিয়া-কোটা, বাঘারুয়া, ফরেস্টুয়া চন্দ্রবর্মণের বিপুল 'নাম্বা' নাম-কাহিনী ভুলে গিয়েছেন। বাঘারুর প্রতি সমব্যথিতায় তিনি গয়ানাথ জোতদারকে জিজ্ঞেস করেন, "উমরাক একখান আধিয়ারি দিছেন?"[২৪] 'বাঘারুক আধিয়ারি?" বিস্মিত গয়ানাথ ভাবে একথা নিশ্চয়ই বাঘারুই বলেছে এম-এল-এ-কে। কিন্তু বাঘারু আধিয়ারি চাইতে পারে না কিংবা সেরকম কোনো চাওয়ার কথাভাবতেও সে পারে না। কেবল একটা ছোট নাম চেয়েছিল সে; সকলের নামই ছোট হয়, তারটাই কেবল বেড়ে যায়, এই লজ্জায়। এম-এল-এও বলেন, না, বাঘারু আধিয়ারির কথা কিছুই বলেনি। বাঘারু যা বলেছিল, অন্তত যা বলতে চেয়েছিল, তা এ্যামেলিয়াবাবুর পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। গয়ানাথের ক্রোধের সামনে বাঘারু বারবার বলেছিল, এ্যামেলিয়াকে সে নিজের নাম বলেছে, জন্মকথা বলেছে, কিন্তু আধিয়ারির কথা কিছুই বলেনি কিন্তু গয়ানাথ বিশ্বাস করেনি, ক্ষমাও করেনি তার এই বিরাট অপরাধ। ফলে বাঘারু পেল গয়ানাথের মহিষের বাথানে নির্বাসন।

> কহিছিস কি কহিস নাই, বুঝিবু এ্যালায়। তুই কালি সূর্য উঠিবার আগত এই তিস্তাপার ছাড়ি চলি যাবি। হু-ই নাগরাকাটাত ডায়না নদীর চরত মহিষের বাথান আছে, ঐঠে থাকিবু।[২৫]

সে নির্বাসনে বাহ্যত বাঘারুর অপমান আছে, কিন্তু সেই প্রকৃতি কিংবা তিস্তা যেমন তার চর-জলস্রোত-পলি নিয়ে একান্তই নৈসর্গিক, বাঘারুও তেমনি। সমালোচক মনে করেন:

> লেখক বাঘারুর জন্মবৃত্তান্ত ও নিজস্ব একটি নাম সন্ধানের জন্য তার যে এম-এল-এর কাছে অনুনয়, সেই ভাষা ও প্রেক্ষণবিন্দু চরিত্রটির জন্মলাভের অনুপুঙ্খ বর্ণনা ও তার প্রাকৃতিক স্বভাব চিহ্নিত করেন। এটি এমন এক চিত্রণ যা প্রতিপন্ন করে 'representation is reality'– এই তত্ত্বকে, বাঘারু উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মধ্যেও অধিক প্রান্তিক– সে রয়ে গেছে আদিমানব স্তরে, অথচ সময়াবর্তে সে আধুনিক উন্নতির ফাঁদে আটকে পড়া এক মানুষ, যে জোতজমি সার্ভে পার্টি, ভোট-মিটিং-মিছিল ইত্যাদি কিছুই বোঝে না।[২৬]

পারিপার্শ্বিকতার সকল কিছুই বাঘারুর প্রত্যাখ্যাত, তার অন্বয় কেবল আদিম উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পটভূমির সাথে। এ কারণেই নির্বাসিত বাঘারু ডায়নার জঙ্গলে পাখির সঙ্গে ভাষাহীন সংলাপহীন বিনিময়ে স্বচ্ছন্দ কিংবা সূর্য-গ্রহণ শুরু হলে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে বাগানের মইষানিকে প্রসব করাতে সমর্থ। তখন জন্মানো বাছুরটাকে সে এমনভাবে কোলে তুলে নেয়, "যেন বাঘারুর বুক তার দ্বিতীয় গর্ভ।"[২৭] বাছুর কোলে বাঘারুর সঙ্গী হয় বুড়িয়াল মহিষ, ভোখা কুকুর। নির্বাসনে শুরুতে যেমন মহিষের বাথানে যেতে থাকা বাঘারুর সঙ্গী হয়েছিল একটা শাদা চাঁদ:

> বাঘারু ডাঙা থেকে লাফ দিয়ে নীচে নামে। আর চাঁদটাও তড়াক করে লাফ দিয়ে আপলচাঁদ ফরেস্টের মাথা থেকে তার মাথার ওপর এসে পড়ে। লাফ দিয়ে নেমে বাঘারুকে দাঁড়াতে হয়। চাঁদটাও আটকে যায়। বাঘারু মাঠ দিয়ে চলা শুরু করে দক্ষিণ হাঁসখালির দিকে। চাঁদটাও গড়িয়ে-গড়িয়ে চলে। চাঁদটা টাকার জলছাপের মত।[২৮]

রাতের চাঁদের মত সকালের আগুনরাঙা আকাশের সূর্যোদয়-ও সমস্ত রঙ নিয়ে মানবও প্রকৃতির সৃজনশীল সমপর্ণের ভাষা হয়ে ওঠে। বাঘারুর দৃষ্টিকোণে প্রকৃতি-রূপ সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে ওঠে। গয়ানাথের বাড়ি থেকে মহিষের বাথানে নির্বাসনের পথে হাঁটা বাঘারুর মাথায় মাথায় চলে আসছে যে আকাশ, 'সবুজ নাগান', সেই আকাশের সবুজের নীচে কোথাও কোথাও কিছু কিছু মেঘ ছিল। সেই সব জায়গায় আকাশের রঙ, মেঘের রঙ, আলোর রঙ মিলে আরো নানারকম রঙ তৈরি হচ্ছিল :

> কুন অং (রং) কুখন ফুটে উঠে আর মিলি যায়, না দেখা যায়, না-বোঝা যায়। ...আগুনের নাখান অংটা দূরত-দূরত চলি যাছে, হু-ই পচিম পাখত তিস্তা নদীর পারত, তার পচিমে জলপাইগুড়ি সদরত, তার পচিমে– সবখানের আকাশ নাল [লাল] টকটকা হবা ধরিছে হে।[২৯]

বাঘারুর বিরাট শরীরটা রঙিন আলোর আঘাতে এভাবেই শিহরিত হতে থাকে। "বরমতলায় সেই সূর্যোদয়ের সামনে নির্বাসনের পথে বাঘারুর শরীরে-মনে কেমন মুক্তির বোধ এসে যায়। কোনো অদৃশ্য আড়াল থেকে উৎক্ষিপ্ত রঙের এই আকাশমাটিব্যাপী বিস্ফোরণে আর নিজের এই শরীরটার এমন মুক্তিতে বাঘারু হাসে।"[৩০] বাঘারুর বিহ্বল চোখেই প্রভাতের সূর্যরঙ-স্নাত, স্বতঃস্ফূর্ত প্রকৃতি পাঠকের কাছেও জীবন্ত ও সজীব হতে থাকে; ভাষাহীন বাঘারুর দেহ-মন জুড়ে উৎকীর্ণ আদিম সৃষ্টিশীল মগ্ন প্রকৃতিরদ্বিমাত্রিক সম্পৃক্তি প্রবলভাবে অনুভূত হয়। সমালোচকের প্রতীতি :

> আর কিছু না থাক তার অন্তত জঙ্গলের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, নিগূঢ় বন্ধন রয়েছে– সব সত্ত্বেও আত্মবোধের জন্য ফরেস্টারচন্দ্রের একটি পোক্ত নির্ভর আছে। যে-তিস্তা, যে-ফরেস্ট, যে-জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে বাঘারুর নিত্য দেয়া-নেয়া, সে-সব কি সামাজিক পরিধির বাইরে নয়? ...জঙ্গলে গয়ানাথের বাথানে, আলাদা আলাদা করে প্রত্যেক গরু মোষের সঙ্গে ঘনিষ্ট আত্মীয়তা তার। তাহলে এমন ভাবা কি ভুল যে ওই নৈসর্গিক প্রাচুর্যের মধ্যে বাঘারুর জন্য যে জায়গা বরাদ্দ, তার মারফত তার বঞ্চিত জীবনের ঈষৎ ক্ষতিপূরণ হয়?[৩১]

নির্বাসিত বাঘারু সূর্যোদয় অবলোকন ক'রে 'সূয্যি ঠাকুরের গান' সামলাতে পারে না; "তার মাথায় ছড়াগিলা গানগিলা পিপিড়ার মত চলি আসিবার ধরে এক্কারে লাইন বান্ধি, একোটা পর একোটা, কোটত আসে কোটত যায় কায় জানে।"[৩২] ডায়না নদীর চরে গয়ানাথ জোতদারের বাথান সামলাতে গিয়েও নিজের মনে গান গায় সে। মইষাল বন্ধুর জন্য আকুল প্রার্থনায় ভরা সেই গান। কথকের প্রশ্ন :

> কাজে কাজে অবিচ্ছিন্নতার সেই গানে এত বিরহ আসে কোথা থেকে? বিরহ তার, মইষাল বাঘারুর জন্যই। ... বাথান বাঘারুর জানা, মোষও বাঘারুর জানা, মইষাল তো বাঘারু নিজেই! বাঘারু তখন না বাজানো দোতরার ঝোঁকে-ঝোঁকে গাইছে–
>
> বাথানে বারোশ মইষ
> ও মোর মইষাল এ্যাকেলা ঘুরেন,
> ঘরত্ মোর এই যৈবনখান্
> কাপড়ে বান্ধি রাখেন।
> অ-মোর মইষাল বন্ধু রে-এ-এ–
> বাঘারু নিজেই নিজের বিরহিণী।[৩৩]

তবে প্রকৃতির সংস্পর্শে বাঘারুর শরীরের ও সেই সূত্রে মনের যে সৃজনশীল উন্মোচন তা বারবার ব্যাহত হয় যখন সে মানুষের মুখোমুখি হয়। চা-বাগানের পাশ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সে বাগানের 'লাইন' থেকে শ্রমিকদের বেরিয়ে পড়া দেখে সে, দেখে তাদের পোশাক-আশাক, তাদের ঘরে ফেরার 'দৈনিক উৎসব'– সেই ভিড়ে বাঘারু বিমূঢ় বোধ করে। মানুষজনের মিছিলে তাকে 'আউলাভাউলা' দেখায়। সে এই ভিড়ের কেউ নয়, সে বড়ো নগ্ন– এতটা নগ্নতা এই মিছিলেরও সয় না। ...একটা ছোট নেংটি তার কোমরের সামনে বাঁধা।... ফলে, সেই একমুখো ভিড়ের সঙ্গে স্রোতের বেগে ছুটলেও বাঘারু স্রোত হয়ে যেতে পারেনা। সে স্রোত নয়, সে স্রোতোবাহিত– তিস্তার স্রোতের টানে যেমন ওপড়ানো শালগাছ ছোটে।[৩৪] শেষপর্যন্ত মিছিলের নারীদের হাসির খোরাক হয়ে যায়। কিংবা চা-বাগানের বাবুর ভর্ৎসনা জোটে। কিন্তু জল-জঙ্গল-জমি সর্বত্রই বাঘারুর স্বচ্ছন্দ অনায়াস বিচরণ আর আত্মীয়তা। "তিস্তার খেয়ালী আপন প্রবাহের মতো বাঘারুরও প্রাকৃত উদ্ভব– প্রাকৃত বিকাশ– পরিণতিহীন প্রাকৃত অগ্রগমণ।"[৩৫] এম-এল-এ কে নদী পার করানো বাঘারু, মইষানিকে বাছুর প্রসব করানো; চা-বাগানে পাথর খুঁজে পাথরকে আদিম মানুষের মতই অস্ত্র করে নেয়া, কিংবা বর্ষার তিস্তায় চার-চারটে গাছের সঙ্গে ভেসে যেতে পারা বাঘারু, তিস্তার চরে গয়ানাথের অমূল্য বৃক্ষ নিয়ে বানভাসি হয়ে রংধামালি বাধের উপরে, গয়ানাথের অপেক্ষায় থাকা বাঘারু– ইত্যাদি বৃত্তান্ত আসলে বিরাট অকৃত্রিম প্রকৃতিতে মানব বাঘারুর আত্তীকরণেরই গল্প। "কিন্তু গয়ানাথ জোতদারের এই বলদমানষিটা কখনো প্রকৃতির অনুষঙ্গে বিস্তৃত বিরাট হয়ে পর্ব পর্বান্তরে যেতে পারে না।"[৩৬] তাই বাঘারুর নির্বাসনের বনপর্ব শেষ করতে দেবেশ রায়কে লিখতে হয়:

> এমন কোনো ঘটনাও ত বাঘারুর নেই, যা একটা কোথাও আরম্ভ হয়ে একটা কোথাও শেষ হয়। ...বাঘারুর সব ঘটনাই তার আগে থাকতে ঘটে আসছে, আর তার পরেও ঘটে যেতে থাকে। ...বাঘারুর প্রতিটি দিনই এক একটা পুরো জীবন। প্রতিটি ভঙ্গিই ত বীরত্বের ভঙ্গি– সে নদী সাঁতরানোই হোক আর পাথরে শুয়ে থাকাই হোক, ভোখার সঙ্গে খেলাই হোক আর বুড়িয়ালের পিঠে দাঁড়ানোই হোক। সে মোষের বাচ্চা বের করাই হোক, আর পাখির ডাক ডাকাই হোক। ...বাঘারুর ত কোনো অর্থ নেই। ...বাঘারুর ত কোনো নাম নেই! সে ত শুধু কাজে কাজে বদলে-বদলে যায় ...কুড়ানিয়া, বাঘারু, পাথরিয়া, মইষাল....তার এই হয়ে ওঠার ত আর শেষ নেই।[৩৭]

বৃক্ষপর্বে বাঘারুর নতুন নাম হয় 'গাছারু'। গয়ানাথের হুকুমে তিস্তার উত্তাল স্রোতে পড়ে যাওয়া ফরেস্টের গাছ নিয়ে স্রোতে ভাসে বাঘারু, গাছগুলোকে দিয়ে মাচা বানিয়ে বানের জলে নিজেকে কিছুক্ষণ স্থিতু করে সে, রায়পুর রংধামালির বাঁধের ওপর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করতে আসা মানুষগুলোকে বিভ্রান্ত করে সে। কারণ তিস্তার বন্যায় বসবাসহীন হয়নি বাঘারু; গয়ানাথ যখন তাকে

গাছগুলোর সঙ্গে ভেসে যেতে বলেছিল, তখন তার কাছে অর্থ ছিল বন্যার জল, স্রোত আর ভাসমান ঐ চারটি গাছের সঙ্গে নিজের শরীরটাকে জুড়ে দেয়া; আর গয়ানাথ ও আসিন্দিরের কাছে তার অর্থ ছিল জল নেমে গেলেও গাছগুলো নিরাপদে থাকবে। তাই উদ্ধার করতে আসা নৌকার মাঝির ইঙ্গিত বা ভাষা বোঝে না বাঘারু :

> সে অর্থটা বুঝতে চায়। এমন জলের মধ্যে যদি এমন সাক্ষাৎকার ঘটে যায় তা হলে সেখানে অর্থবিনিময়ে দেরি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তবু যে ঘটছে তার কারণ বাঘারুর আজীবন অর্থবোধহীনতা, এমন-কি অন্যের শরীরের ভাষা বোঝার অক্ষমতা, শরীরেরও অক্ষরজ্ঞানহীনতা। বাঘারু তার নিজের শরীর দিয়ে একটার পর একটা এমন কাজ করে যেতে পারে– যার একেবারে নিকট অর্থ হয়ত তার কাছে ধরা পড়ে, বা যারা দেখে তাদের কাছে হয়ত একটা দূরার্থও এসে যায়।[৩৮]

এই একই কারণে তিস্তার জলে চারটি গাছ নিয়ে যে বিশ্বস্তভাবে ভেসে এসেছে, বাঁধের উপরে কাঠের আড়তদার চারটি গাছের অন্তত একটি বিক্রি করে টাকা নিতে বললে বাঘারু তা করতে পারে না। এ নিয়ে তার কোনো মানসিক দ্বন্দ্বও হয় না। বাঘারুর চিন্তায় স্তরপরম্পরা কিংবা পরম্পরাহীন জট হয়তো আছে আরো সব মানুষের মতই, "কিন্তু সেই আর সব মানুষ থেকে তার পার্থক্যও আছে।"[৩৯] ঔপন্যাসিককেও তাই বাঘারুর প্রসঙ্গে লিখতে হয় :

> তার প্রতিদিনের বাঁচা এই শরীরের সর্বস্বতা দিয়েই বাঁচা। ...এমন-কি হাজার হাজার বছর ধরে তৈরি মানুষের এত পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে মাত্র দেড় হাতি এক ত্যানা লেগে আছে যে-বাঘারুর সম্পূর্ণ মানব শরীরটিতে, সেই দেড় হাতি ত্যানাতেই মাত্র যে-বাঘারু মানব সভ্যতার সঙ্গে বাঁধা– সেই বাঘারু, প্লাবিত নদীতে, বৃষ্টিতে, ঝড়ে ও অন্ধকারে এতটা বন্যা পেরিয়ে আসা এই শরীরটা থেকে একটা গাছের বাঁচা বেচে দেবে কী করে? বাঘারুর যেমন মন নেই, তেমনি হয়তো মাথাও নেই।[৪০]

বাঘারু এভাবেই নিরন্তর তার অনন্বয় সৃষ্টি করে চলে মানবসমাজের সঙ্গে। "আপাদমস্তক ভেদচিহ্নে মোড়া বাঘারু, ফলে, মানুষ যেখানে জোট বাঁধে সমাজ গড়ে, সেখানেই সে নিরাশ্রয়।"[৪১] ব্যক্তির সত্তা, স্বাধীনতা, নিজস্ব স্বর, জগত– সাধারণত ব্যক্তি সম্পর্কিত এইসব ধারণার সম্পূর্ণ বাইরে বাঘারু কেবল তার শরীর নিয়ে বাংলা উপন্যাসে ব্যতিক্রম হয়ে উঠেছে। বাঘারুরও আছে সত্তা, তবে তা প্রকৃতিতে লীন স্থানিকতাকেই দ্রষ্টব্য করে; আছে স্বাধীনতা, কিন্তু তা শরীরের অভিব্যক্তিতেই নিঃশেষিত; মহাপ্রকৃতি তার জগত, সেখানেই তার সমস্ত বোঝাপড়া। তার শরীরের ভাষা সে-ই ঠিক করে, ফলে সে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, স্থানান্তর ঘটাতে পারে নিজের। সমাজ-সভ্যতা নিরপেক্ষ সংবেদনশীল মানব বাঘারু তাই বিচ্ছিন্ন 'অপারেশন বর্গা' (ভূমি জরিপ) থেকে, কৃষক-মজুর-শ্রমিক আন্দোলন থেকে, উত্তরখণ্ড আন্দোলনেরও সে কেউ নয়, তার 'সিপিএম' নেই, জিন্দাবাদ, ঝাণ্ডা, মিছিল কিংবা লাল সেলামও নেই। স্বদেশ, স্ব-কালে জটিল রাজনৈতিক পরিবেশ, স্থল-জল ও বনভূমির অনুপুঙ্খ বর্ণনা সর্বোপরি সেই পটে ব্যক্তি মানুষের যে বহিঃপ্রকাশ এই উপন্যাসে রয়েছে, বাঘারু সেখানে মৌলিক-ই থেকে গেছে। 'মিছিল পর্বে' অভিজ্ঞানহীন, ভাষাহীনশুদ্ধ মানুষবাঘারুর তৃতীয় সংলাপ লক্ষণীয় :

> : 'তোমরালা একা-একা ঝাণ্ডাখানা খাড়ি করি এ্যালায় টারিঠে বাহির হবা ধরছু, আর এ্যালায় হাট শেষ করি টারিত ফিরিবার ধইচ্ছু একা-একা। তোমরালার আর কুনো মানষি নাই?'
>
> : 'মোর আর কুনো মানষি নাই। মোর একেলা মুই আছো।'
>
> : 'তোমরালা কি উত্তরখণ্ডত জয়েন দিছেন?'
>
> : 'হামারার কুনো খণ্ড নাই, কুনো জয়েন নাই।'
>
> :'না, না কহিছু, তোমরালার জোতদারখানত জয়েন দিবার ধইচছে।'

: 'না জানো'

: 'না  জানো ত ঝাণ্ডখান কান্ধত করি একেলা-একেলা হাট-বাট ঘুরিবার ধরিছেন কেনে?'

: 'মোক গয়ানাথ কহিছে তাই ঘুরিবার ধরিছু। মোক ত আগতও ঝাণ্ডা দিছে গয়ানাথ।[৪২]

মিছিলে গয়ানাথের হুকুমে ঝাণ্ডা হাতে বারংবার বাঘারুর দৃঢ়চেতা উত্তর :

...'না-হয়। মোর কুনো ঝাণ্ডা নাই।'

তিস্তার বন্যায় রংধামালির বাঁধে সরকারি অফিসারের জিজ্ঞাসাবাদেও 'গাঙ্গুয়ামানষি' বা 'গাছারু' সম্বোধিত বাঘারুর উত্তর :

মোর নামঠিকানা নাই রো। গয়ানাথ জোতদার মোর দেউনিয়া। উমরার নাম লেখেন-[৪৩]

সে আরো জানায় স্থানীয় আদিবাসীদের মত সে রাজবংশী বা ভাটিয়াও নয়। যেন অন্তহীন নেতি দিয়েই তৈরি বাঘারু। যেন সে একটা "ভাসমান চিহ্নক, আধেয়বিহীন শূন্য আধার।"[৪৪] একপর্যায়ে ঔপন্যাসিকের বাঘারুর-বিবরণ যুক্তি-পরম্পরা হারায় :

> দশ-বার বছরে (বাঘারুর) মাত্র তিন-তিনটি সংলাপ– তাও ক্রমেই নেতিবাচক। বাঘারু কি তার জীবনে ক্রমেই নিজের কাছে নিজে অবান্তর হয়ে পড়ছে– ধারাবাহিকভাবে?[৪৫]

অথচ তিস্তাপারের এমন কোনো ঘটনাই নেই যার সঙ্গে বাঘারু জড়িয়ে না যায়, অপারেশন বর্গার কাজে, বন্যার জলে, উত্তরখণ্ডীদের আয়োজিত সংস্কৃতির সদাচারে, কামতাপুরের দাবিতে ঝাণ্ডা হাতে মিছিলে, সবশেষে তিস্তা ব্যারেজে। কোনো কিছুর অংশী না হয়েও সে পৌঁছে যায় যাবতীয় সংঘাতের কেন্দ্রে।

*তিস্তাপারের বৃত্তান্তে* জাতি-বর্ণ ও অর্থনীতি-রাজনীতির সূত্রে নানা শ্রেণিচরিত্রের সম্পর্ক-সূত্রবিন্যাস বিশ্লেষিত হয়েছে। কেন্দ্র ও প্রান্তের বহুমাত্রিক সংঘাত ও দ্বন্দ্ব; আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে চিত্রিত হয়েছে চা-বাগানের জমির অধিকার প্রশ্নে কৃষক-মজুরের অমীমাংসীত সংঘাত, 'রাজবংশী' বনাম 'ভাটিয়া', 'চরুয়া' ও তীরবর্তী মানুষ, জোতদার-আধিয়ার, সিপিএম বনাম উত্তরখণ্ডী–পরস্পরবিরোধী এই শ্রেণি-সংঘাত বা সময়ান্বিত ব্যক্তির জটিলতা দেবেশ রায় ধরতে চেয়েছেন একজন নৈর্ব্যক্তিক কথকের মতই। তাঁর সমাজতাত্ত্বিক বীক্ষণেই স্পষ্ট হয়েছে সমাজ ইতিহাসের ঐতিহাসিকতা, ক্রমান্বয়তা, পরম্পরা। আর সেই স্তরে ব্যক্তির ইতিহাসও নির্মিতি পেয়েছে। সমালোচকের মতে :

> দেবেশ রায়ের উপন্যাসে নিরক্ষর বাঘারুদের পাশাপাশি রয়েছে রাজবংশী-মদেশিয়া-নেপালি-বাঙালি, কৃষক-মজুর, জোতদার প্রতিনিধি গয়ানাথ, চা-বাগানের কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, কর্মচারী। না, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত 'বাঘারুচরিতমানস' নয়, তাতে কেন্দ্রচরিত্র বলে কিছু নেই। ... দেবেশ রায়ের উপন্যাসের বিষয়: 'ইতিহাস'। ইতিহাসের চলিষ্ণুতার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে বদ্ধপরিকর কথক।[৪৬]

অবশ্য দেবেশের এই ইতিহাস-বর্ণন সরল নয়। সামাজিক-অর্থনৈতিক কিংবা রাষ্ট্রিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর (উচ্চ-নিম্ন) সংঘাত অধুনা সময়ে যতটা না সম্মুখ, তার চেয়ে অনেক বেশি দ্বান্দ্বিক। আধুনিক উপন্যাসে জন-বিন্যাস তথা বহুকৌণিক দ্বান্দ্বিকতার বিশ্লেষণী বিবরণ চলে আসে। বিশ শতকের শেষ দুই দশকে ভারতে তফশিলভুক্ত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক শ্রেণির রূপান্তর ঘটেছে, আর্থ-সামাজিক নিয়মের স্বাভাবিকতায় তাদের নিজেদের মধ্যেও গড়ে উঠেছে শোষক-শোষিতের সম্পর্ক। এ কথাটি উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের বিষয়ে সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। রাজবংশীরাই দেবেশ রায়ের উপন্যাসের প্রধান লোকসমাজ। তিস্তা-অববাহিকায় রাজবংশীদের বহুকালের বসতি। তিস্তাপারের রাজবংশীদের মধ্যে তাই জোতদার থেকে কৃষক সব শ্রেণিকেই দেখা যায়। এমনকী দেখা যায় নিঃস্বত্ব ভূমিদাসকেও– যার

শ্রমের জন্য তার মালিককে কোনো পারিশ্রমিক দিতে হয় না। রাজবংশীদের জাতি-ধর্ম-বংশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত বিবৃত হয়েছে *তিস্তাপারের বৃত্তান্তে*। চিহ্নিত হয়েছে 'উত্তরখণ্ড' নামে স্বতন্ত্র এক রাজ্যের দাবি যেখানে রাজবংশীরাই হবে প্রধান নাগরিক ও ভাষা-ভাষী। সমকালে নয়া স্বীকৃতি পাওয়া নয়া আঞ্চলিকতাবাদ এক্ষেত্রে মূল কারণ নিয়ে উপস্থাপিত। "বৃহত্তর অর্থে কেন্দ্রভিত্তিক একীকরণের রাজনীতি তার দাপটে ধ্বংস করে সৃষ্টিশীল উন্নয়নের মূল সুর, যৌথসত্তাকে। কিন্তু এটাও তো সমান সত্যি, এ ধরণের সুবিধাভোগী আঞ্চলিক রাজনীতির 'প্যাকেজে' 'এক জাতি এক প্রাণ'-এর মতো জাতীয় সংহতির শ্লোগান এক সরল বিকৃত রূপ পায়। আর কেন্দ্রও সমঝোতা করে আঞ্চলিক এলিট গ্রুপের সঙ্গে।"[৪৭] বিভিন্ন পর্বে এই সমঝোতাই দেখি *তিস্তাপারের বৃত্তান্তে*। অর্থ-ক্ষমতার শক্তিতে জমির সার্ভেয়ারের সঙ্গে কিংবা আদালতে উকিলের মাধ্যমে জমির অধিকারের প্রশ্নে গয়ানাথ জোতদার চায় সমঝোতা করতে; তিস্তা ব্যারেজের কাজ এগিয়ে চলে, বেড়ে চলে গয়ানাথের পাওনা-গণ্ডার হিসেব-নিকেশও। কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আসীন দল চায় রাজ্য বা আঞ্চলিক দলগুলোর সাথে বোঝাপড়া করে নিতে; 'সবুজ বিপ্লবের এনট্রেপ্রানিয়ুর কৃষিবিনিয়োগকারীর' সমঝোতা হয় নকশালিয়া মতবাদীর সাথে। *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* উপন্যাসের বড় অংশ জুড়েই রয়েছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ। সুহাসের তত্ত্বাধানে জমি জরিপের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের শুরু, ক্রমান্বয়ে বাঘারু ও বাঘারু কর্তৃক গয়ানাথের বাথান পরিচালনা, বন্যাক্রান্ত জনসাধারণের আত্মরক্ষার প্রয়াস, উদ্বাস্তু মানুষজন, তিস্তার বন্যা, বৃক্ষবাহনে বাঘারুর যাত্রা, ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তবাহিনী, উত্তরখণ্ড পার্টির রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তিস্তা ব্যারেজ নির্মাণ ও উদ্বোধন, মাদারি ও তার মায়ের স্বতন্ত্র আবাসভূমি, মিছিল-মিটিং প্রভৃতি ঘটনায় সমৃদ্ধ এক পরিশিষ্টসহ ছয় পর্বে দীর্ঘ উপন্যাস এটি। এর আদিপর্বেই দেশীয় রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি-পরিবেশ নানাভাবে চিত্রিত। কৃষক-শ্রমিকের পরস্পর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়কেন্দ্রিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, জোতদার ও ক্ষুদে রাজনীতিবিদদের কর্মকাণ্ড, সিডিউল সিটের এম-এল-এর প্রত্যক্ষ আবির্ভাব ও গতিবিধি প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে এই উপন্যাসটিতে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক পরিবেশের সূচনা ঘটে। আদিপর্বে 'কৃষক সমিতির প্রোগ্রাম', 'রাধাবল্লভের বক্তৃতা', 'কৃষক মজুর : আলোচনা', 'কৃষক মজুর : লেনদেন', 'কৃষক-মজুর : শ্রেণি-সংগ্রাম', 'কৃষক মজুর : সম্মুখ সংগ্রাম', 'কৃষক-মজুর : ঐক্যের সংগ্রাম', 'একি কৃষক না মজুর' প্রভৃতি অংশে ক্রমশ নিদিষ্ট অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, এমনকী 'বৃক্ষ পর্বে' বন্যাজলবেষ্টিত বাঘারুর উদ্ধার পরিকল্পনার মাধ্যমেও রাজনৈতিক কর্ম-প্রবাহের প্রকাশ ঘটেছে। বিশেষত 'মিছিলপর্বে' উত্তরখণ্ডের স্বতন্ত্র রাজ্য দাবির পরিপ্রেক্ষিতে একদিকে বিত্তবানদের স্বার্থ সংরক্ষণকারী রাজনীতি; অন্যদিকে সর্বহারা শ্রেণির পক্ষে কর্মরত রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সীমাবদ্ধতা প্রকাশিত হয়েছে। এই সূত্রেই বাঘারুর মালিক গয়ানাথ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হয়, তাছাড়া এই পর্বে পঞ্চানন বাবু, বীরেন্দ্রনাথ বসুনিয়া, শিল্পমন্ত্রী, সন্তোষবাবু, সুবিমল বাবু, হেমেনবাবু প্রভৃতি রাজনীতিবিদদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ক্ষেত্র বিশেষে চিহ্নিত হয়েছে। সর্বোপরি জলপাইগুড়ি অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিবেশ তার সম্পূর্ণতা নিয়ে হয়েছে উদ্ভাসিত। "এ অঞ্চলের রাজনীতি যেমন সাধারণ মানুষজনের সচেতন বোধ, স্বার্থ-বিমুক্ত কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের রাজনৈতিক চাতুর্যে আবর্তিত, তেমনি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও জনবিচ্ছিন্ন রাজনীতিবিদদের কূটচালে মন্থিত এবং এই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড জনবিচ্ছিন্ন স্বার্থপর রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই বিকৃত– উত্তরখণ্ড সম্মিলন উপলক্ষ্যে শ্রীদেবীর নৃত্যানুষ্ঠান এই বিকৃতির চূড়ান্ত নিদর্শন।"[৪৮] রাজনীতির প্রধান নিয়ন্তা হয়ে ওঠে পুঁজি, দেবেশ সেই রাজনীতি-চারিত্র্যের রূপান্তরও ব্যাখ্যা করেছেন :

> হয়তো উত্তরখণ্ড আন্দোলনেরমত ঘটনা এ-রকম নানা পরস্পরবিরোধী স্বার্থ মিশিয়েই তৈরি হয়। কখনো এই স্বার্থ কখনো ঐ স্বার্থ প্রাধান্য পায়। কিন্তু রাজবংশী জোতদারের নতুন টাকার যোগ্য বিনিয়োগক্ষেত্র খোঁজার জন্যে এ-ধরণের আন্দোলন এখন অনেকদিন পর্যন্ত তৈরি হয়ে উঠবে। বৃহত্তর ভারতে ব্যবসা ও শিল্পের বাড়তি, হিশেববহির্ভূত, অসংখ্য টাকায় যে-সামাজিক শ্রেণী তৈরি হয়ে গেছে– রাজবংশীরাও তা থেকে আলাদা নয়।[৪৯]

'নিখিল বঙ্গ উত্তরখণ্ড সমিতি'র প্রথম সম্মিলনে রাজবংশী, মুসলমান, নমঃশূদ্র ও অন্যান্য উপজাতি মানুষের অত্যাচারের কথা বলা হয়। রাজবংশী সমাজের উপজাতিগত পরিচয় ও তাদের সমাজের রূপ-রূপান্তরের বয়ানও জেনে যায় পাঠক। কিন্তু তা কেবল ইতিহাস-বিবৃতিই হয়ে থাকে। আন্দোলনে সরকার ও বিরোধী পক্ষের এম.এল.এর-দের মধ্যে মিটিং-এ ঠাট্টা-ইয়ার্কি হয়, মূল প্রস্তাব নিয়ে আলোচনাই হয় না; দু-দিনের সম্মিলনে প্রতিদিন একই বক্তৃতা হয় কিংবা প্রতিদিন বক্তৃতা করার লোকও পাওয়া যায় না; সেখানে গয়ানাথের মত জোতদার ভাষণ দেয়। তিস্তা ব্যারেজের সঙ্গে-সঙ্গে জমির অধিগ্রহণ, কৃষকের উচ্ছেদ, তাদের বিপন্নতা, ব্যারেজ বা ড্যামের ফলে যে-উপকার হবে তার সঙ্গে গরিব মানুষের সম্পর্ক না-থাকা– এইসব অমোঘ সত্যভাষণের সঙ্গে মিশে যায় নানারকম রাজনৈতিক ফন্দিফিকির। গয়নাথের সংক্ষিপ্ত এবং 'সিধে ও সরল ভাষণ তার চমৎকার উদাহরণ। তারপর সম্মিলনের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় নাচ-গান-ভিডিও ইত্যাদি। বরাবর নিয়মেই সর্বহারা মানুষের অধিকার সংরক্ষণের আন্দোলন রূপ পায় না; তারা 'জলুশে' সামিল হয় শুধুমাত্র মালিকের হুকুমে কিংবা কিছু খেতে পাওয়ার আশায়। সেই মিছিলও হারিয়ে যায় তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধন উপলক্ষে সরকারি অনুষ্ঠানের আয়োজনে। সরকারি পুলিশ বাহিনী 'মাত্র কয়েক মিনিটে উত্তরখণ্ডের স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি আপলচাঁদের এক টুকরো জমির ওপর মেরে, ভেঙে, থেঁতলে ফেলে চলে যায়।'[৫০] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'মিছিলপর্বে'র বিপুল রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞে বাঘারুর অবস্থান গয়ানাথ কর্তৃক নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও বাঘারু আশ্চর্যজনকভাবে রাজনৈতিক চেতনাবোধহীন। "শুধু তিস্তার ভেতরে ঐ বিরাট প্রাচীর, প্রাচীরের ওপর অত গেট আর মঞ্চ, গেটে আর মঞ্চে এত ঝাণ্ডা"[৫১] দেখে বাঘারু অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। উত্তরখণ্ড, কামতাপুর, গোর্খাল্যান্ড, পুরনো চরের নমঃশূদ্রদের আন্দোলনের সামনে পড়ে সরকার তড়িঘড়ি অসম্পূর্ণ তিস্তা ব্যারেজের উদ্বোধন করে দিতে মনস্থ করে। মুখ্যমন্ত্রী আসেন বলে সে সরকারি অনুষ্ঠানে ট্রাক-ট্রাক মানুষ যায়– জনসভায় মানুষের মাথার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে। যায় মাদারি, মাদারির মা– এই ব্যারেজ নির্মাণ বা উদ্বোধনের সঙ্গে যাদের কোনো সম্পর্ক নেই। মাদারির মা আসে খাদ্যের সন্ধানে এবং তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানদের খোঁজে। সেই মাদারির মা– যাদেরকে সংজ্ঞায়িত করা হয় 'দারিদ্র্যসীমার বাইরে' বা 'পশ্চাদপদ অংশ' বলে। দেবেশ রায়ের *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রই নিম্নবর্গের পরিধির বাইরে। মাদারির মা তাদের অন্যতম। ঘরবাড়িহীন, সমাজ পরিত্যক্তা মাদারি মা– জঙ্গলের মধ্যে শ্যাওড়া গাছের নীচে যার আশ্রয়, যে বাঁচে বনের পশুর নিয়মে; যার প্রতিদিনের খাদ্য তালিকা ভদ্রস্থ সমাজ-মানুষের কল্পনার বাইরে– সেই মাদারির মায়ের মত মানুষেরা সমাজ উন্নয়ন কিংবা তিস্তা ব্যারেজ দিয়ে কি করবে! "ভারতের উত্তরখণ্ডে স্বতন্ত্র রাজ্য দাবির ইতিহাসের সঙ্গে মাদারির মাকে অন্তর্ভুক্ত না করে দেবেশ রায় বিপ্রতীপ রাষ্ট্রভাবনার উজানে চলে যান। ...ব্যারেজ উদ্বোধনের মিছিলের আবর্তে মাদারির মা আবার সন্তান হারিয়ে ফিরে আসে তার শ্যাওড়াঝোরা রাষ্ট্রের পাতায় কুটিরে।[৫২] অন্ত্যপর্বের শেষ অধ্যায়ে শেষ পঙ্‌ক্তিসমূহে তাই ঔপন্যাসিক লেখেন:

> মাদারির মায়ের দারিদ্র্যের মধ্যে ত কোনো গৌরব নেই, বড় বেশি অপমান আছে। সেই অপমানের বিচ্ছিন্নতাকে বিদ্রোহের বিচ্ছিন্নতা বলে ভাবার মধ্যে, তার সাতকাহন বৃত্তান্ত জানার মধ্যে, মিথ্যে কিছু থেকেই যায়। ভারতবর্ষে যারা কালি-কলম ব্যবহার করতে জানে, আমাদের মতো, তারা জানে না ভারতবর্ষের দরিদ্রতম ছ-সাত কোটির কথা কোন অক্ষরে লেখা হয়ে যায়। তাই অক্ষরজ্ঞানহীন এই বৃত্তান্ত যত লেখা হবে ততই মিথ্যা হবে 'সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।'[৫৩]

বাঘারু কিংবা মাদারির মা-র এই বিযুক্তি কিংবা বিজনতাই এই বৃত্তান্তের মূল সত্য হয়ে ওঠে; অপরদিকে অক্ষরসর্বস্ব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়ন উন্নয়নের প্রকল্প, রাজনীতি-সমাজ সংক্রান্ত বর্ণনা হয়ে পড়ে অবান্তর। জীবনধারণের এতটা নিম্নতম স্তরে তাদের অবস্থিতি যে বাঘারু কিংবা মাদারির মা-র নিঃসঙ্গতা ও দারিদ্র্যকে ঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না। এ প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন:

> দারিদ্র্য তো এই পরিবেশের সর্বাঙ্গে। সবরকমের ধূর্ততা, পচন ও সুবিধাবাদের মধ্যেও প্রাধান্য দারিদ্র্যেরই। শুধু তো খেতে-পরতে না পারার দারিদ্র্য নয়, অস্তিত্বের সর্বাঙ্গীন দারিদ্র্য। পাঠকের বা এমনকী হয়তো লেখকেরও দারিদ্র্যকে চেনার যে পরিধি তাকেও ছাড়িয়ে যায় তা। সংবাদপত্রে, রাজনৈতিক নেতাদের ভাষণে, নিত্য প্রকাশমান নথিতে বা পরিসংখ্যানে যে দারিদ্র্যের কথা পড়ি বা শুনি, তাকে তুচ্ছ করে দেয় এই দারিদ্র্য। ...বাঘারুর সঙ্গে আমাদের অপরিচয় ততটাই যতটা আমাদের রাজনীতি-সমাজনীতি বা আমাদের চিন্তা-অধ্যয়ন বা আমাদের মানবিক আবেগ ছুঁতে পারে বাস্তবের ওপর স্তরকে। আমাদের জ্ঞানের বা অনুসন্ধানের যে নিরুপায় সীমাবদ্ধতা তারই যেন প্রতীক হয়ে ওঠে বাঘারুর এই অপরিচয়। ...এই স্বাতন্ত্র্য ও আবিষ্কারের ওপর জোর দেওয়ার জন্যই বাঘারুর উপস্থাপনার ডিটেল্‌সের মধ্যে একটা আতিশয্য-নির্ভর কমিকেরও আভাস হয়তো আসে; পাছে আমরা নিছক বাস্তবের সংজ্ঞাতেই তাকে চিহ্নিত করে ফেলি শুধু– এর প্রতীকরূপকে শনাক্ত করতে ভুলে যাই।[৫৪]

*তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* উপন্যাসটি নিম্নবর্গের কথকতা কি না তা এ প্রসঙ্গেই আলোচ্য। নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র ক্রিয়াকলাপ এবং রাষ্ট্র তথা আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্রের সর্ববিস্তারী জাল– এই দুইয়ের সমন্বিত বিবৃতি *তিস্তাপারের বৃত্তান্তে* আছে। "তিনি (দেবেশ) চেষ্টা করেছেন elite-এর বিপরীত (other) হিসেবে সাব-অলটার্নকে কীভাবে নির্মাণ করা যায়। এছাড়া *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*-র নায়ক speaks, সে বলতে পারে, 'এ ভারতবর্ষ হামার দেশ নয়।"[৫৫] কিন্তু দেবেশ রায়ের উপন্যাসে ক্ষমতা বা কেন্দ্র কর্তৃক শোষণের বিপরীতে other অর্থাৎ অপরের প্রাসঙ্গিকতা এখানে এসেছে প্রত্যাখ্যানের সূত্রে। তিস্তা ব্যারেজ তৈরি, সরকারের খাস জমির অধিগ্রহণ নিয়ে বড়লোক জোতদার, টাকার মালিক ক্ষমতার মালিক নানা শ্রেণির ও পেশার মানুষের রাজনীতি-সংযুক্ত ও বিবৃত অর্থনীতিই এ আখ্যানের একমাত্র ব্যাপার নয়। ব্যারেজ তৈরির ফলে মিছিলহীন ও নদীহীন সর্বস্বহারা বাঘারু এবং শ্যাওড়োঝোরার মাদারির মা ও মাদারির মূলত কোনো অর্থনীতি নেই, আছে শুধু শরীর– যা দিয়ে শেষ পর্যন্ত ঐ অর্থনীতিকে তারা প্রত্যাখ্যান করে। এই মানুষগুলোকে কোনো বর্গে বা অর্থনৈতিক শ্রেণিতে চিহ্নিত করা যায় না। এ আখ্যান "শেষপর্যন্ত তাই নদী-অন্বিত মানবসভ্যতার ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের রাজনৈতিক ইতিহাসকে প্রাকৃতিক-শারীরিক, ব্যক্তিকর্তৃক প্রত্যাখ্যানের ইতিহাস, আবার একইসঙ্গে ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক ঐ প্রকৃতি-শরীরকে নিরন্তর ভাঙাগড়ার নাট্যমঞ্চও বটে।"[৫৬] আর দেবেশের উপন্যাসে নিম্নবর্গের চরিত্রায়ণ প্রসঙ্গে বলতে হয়– বাঘারু, মাদারির মা কিংবা খেতখেতু-টুলটুলি (*মফস্বলি বৃত্তান্ত*), রাধিয়া-কেলু (*সময় অসময়ের বৃত্তান্ত*) ইত্যাদি চরিত্রগুলো "বাংলা উপন্যাসের জগতে আসেনি সাব-অলটার্ন স্টাডিজের-এর প্ররোচনায়। অভিজ্ঞতার চাপ ও মানবমুক্তির যথার্থ কল্পনাই দেবেশকে নিয়ে গড়িয়ে নিয়েছে এইসব চরিত্র। এর কোনোটাই তত্ত্ব নয়। দেবেশের উপন্যাসের গঠন বেরিয়ে এসেছে সেখান থেকেই– কোনো স্ট্রাকচারালিজমের কোনো ঘরানা থেকে নয়।... একটি চরিত্রের প্রাধান্যকে হারিয়ে বহু চরিত্রের স্বর, বহু কাহিনীর স্বাধিকার, আদিমধ্যঅন্ত্যহীন অনিঃশেষ বিস্তার যদি উপন্যাসের একটি স্বতন্ত্র ও অমোঘ ভাষাকে জন্ম দিয়ে থাকে, তা তো তৈরি হয়েছে সত্যিকারের বাঙালি অভিজ্ঞতারই রোদেজলে।"[৫৭] এ উপন্যাসে নিম্নবর্গ প্রসঙ্গে যদিও কোনো সমালোচক মনে করেন :

> দেবেশ রায় 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' নামক মহাকাব্যিক আখ্যানে ও অতি সাম্প্রতিক যোগেন মণ্ডল সংক্রান্ত উপন্যাসের বয়ানে নিম্নবর্গীয় পরিসরকে নতুন প্রকরণে পুনরাবিষ্কার করতে চেয়েছেন।[৫৮]

তবে এই আখ্যানে নিম্নবর্গীয় চেতনার অনুসন্ধান একমাত্রিক বা সর্বাগ্র নয়। অর্থাৎ এটি কেবল নিম্নবর্গেরই আখ্যান নয়।

*তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* উপন্যাসটি আঞ্চলিকতায় বিশিষ্ট কী না সে প্রসঙ্গটিও বিবেচ্য। সাধারণত আঞ্চলিক উপন্যাসে নির্মিত জীবনদর্শন, ভাষা-সংলাপ, ঘটনা কিংবা চরিত্রায়ণ– সবকিছুই একটা নির্দিষ্ট আঞ্চলিক ভাব ও আবহকে উপস্থাপন করে; যদিও তা বৃহত্তর সমাজ ও জাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন নয়।

একটি অঞ্চলের বহমান সংস্কৃতি, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, ভাষাভঙ্গি, ভৌগোলিকতা, স্থানিক রং-প্রভৃতির সমবায়ে পূর্ণ জীবনকে রূপ দেয়ার সূত্রে *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*কে আঞ্চলিকতা-বিশিষ্ট বললে ক্ষতি নেই। তবে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল– বিবর্তিত সময় ও সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির পালাবদল এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সমান্তরালে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসীমার যে পরিবর্তন ঘটে– একটা বিশেষ অঞ্চলের আবহমান ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি লালিত প্রাকৃত জনমানুষ সে বিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত কি না তার ইতিকথা রূপায়ণের আলোকে বৃত্তান্তটি বিবেচ্য। বহমান তিস্তা নদী ও পরবর্তীকালে নির্মিত তিস্তা ব্যারেজকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি এগিয়েছে। সেইসাথে পারিপার্শ্বিকতায় অবস্থানরত ব্যক্তিবর্গের ক্রিয়াকর্ম, চিন্তাধারার মাধ্যমে তিস্তা, জলপাইগুড়ি ও তৎসংলগ্ন সমতল ও বনভূমির সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আর্থসামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনের উপস্থিতি এই বৃত্তান্তে দেবেশ রায়ের মার্কসীয় চেতনাসমৃদ্ধ জীবন দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশেরই অংশ। তিস্তাপারের স্থানিক আয়তন এর কথনকে সংহত করেছে বলেই সমালোচকের মত।[৫৯] স্থান নাম যেমন– ক্রান্তিহাট, আপলচাঁদ ফরেস্ট, গাজলডোবা, নিতাইদের চর, মালবাজার, চালসা, মাদারিহাট ইত্যাদি, স্থানিক নিসর্গ-ভূপ্রকৃতি, স্থানিক রাজনৈতিক বাস্তবতা (এম-এল-এ ও পি.ডব্লিউডি ইঞ্জিনিয়ারের ব্রিজকেন্দ্রিক রাজনীতি, গয়ানাথ জোতদার-ব্যারেজপ্রকল্প-উত্তরখণ্ড রাজনীতি, বামফ্রন্ট-উত্তরখণ্ড পার্টি রাজনীতি), স্থানিক অর্থনীতি (জমি ও ফসল, জঙ্গল ও অর্থ, চর ও কৃষি, চা-বাগান ও চা-শ্রমিক, বন ও বাথান),স্থানিক সংস্কৃতি(তিস্তাবুড়ির পূজা, বাঘারুর সঙ্গীত), বসতিকেন্দ্রিক সামাজিক বাস্তবতা (রাজবংশী-ভাটিয়া)– এইসব স্থানিক প্রসঙ্গ ও বাস্তবতাকে উপস্থাপন করতে চায় বলেই "উপন্যাসের পর্ব-বিন্যাসে কথন কিছু কিছু ঘটনা তৈরি করে নিয়েছে। অনুপুঙ্খ কথন-ক্রিয়ার সমাহারে এই বৃত্তান্তের কথক ঘটনা নির্মাণ করেন।"[৬০] তাছাড়া কেবল তিস্তাপারের বাসিন্দাই নয়, উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সুদূর অতীতকাল থেকে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করে আসা রাজবংশী সমাজের পেশা জনজীবনের পরিচয় বিশেষত তাদের মুখের প্রকাশে ভাষা বিষয়ে দেবেশ রায়ের নিরীক্ষা এ বৃত্তান্তের অন্যতম সফলতা। উপজাতি আদিবাসী রাজবংশী, নমশূদ্র, কোচ, বোরো, যারা শত বছর ধরে মিলিয়ে যেতে চেয়েছে হিন্দুসমাজের সাথে, কিন্তু হিন্দুসমাজ তাদের গ্রহণ করেনি। যদিও এরাই ভারতের উত্তরাঞ্চলের ইতিহাস স্রষ্টা। এরাই তিস্তা-কাহনেরও রচনাকার। "বৃত্তান্ত তো কথকিয়া লিখছেন না, কখনো হাটুরেদের কথা, শব্দ, ভাষায় লেখা হয়ে যাচ্ছে অঞ্চলের ইতিহাস। সেই সঙ্গে আঞ্চলিক ভূগোলকে চিনিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন কথকিয়া।"[৬১] দেবেশের কথাসাহিত্যে রাজবংশী ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে দুই প্রকারে, প্রথমত সংলাপের মধ্য দিয়ে, দ্বিতীয়ত বর্ণনা অংশে। সাহিত্যে উপভাষা বিশেষ করে রাজবংশী ভাষার প্রয়োগ সম্বন্ধে দেবেশ রায়ের বক্তব্য নিম্নরূপ :

> আমি রাজবংশী ভাষা রাজনীতির প্রয়োজনে শিখেছি, যখন শিখলাম একবারও ইচ্ছে হয়নি ঐ রাজবংশী ভাষায় আঞ্চলিক গল্প লিখব। আমার মনে হয়েছিল ঐ রকম আঞ্চলিক লেখালিখির দরকার নেই। কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, স্বাভাবিক গদ্যে একটা গল্প এগচ্ছে হঠাৎ একটা রাজবংশী সংলাপ এসে গেলে, সেখানে গল্পটার আখ্যানভাগ একটা অন্য অর্থের মধ্যে ঢুকে পড়ছে, সেখানে থেকে আবার বর্ণনার ভাষায় চলে আসতে পারছি। আখ্যানটাকে দু-তিনটি স্তরে কাজ করানো যাচ্ছে। ...আখ্যানের ধরন যে বদলে যেতে পারে, দু-তিনটি স্তরে যে আখ্যানকে ছড়িয়ে দেখা যায় এটা আমি জেনেছি রাজবংশী ভাষা শিখবার পর, রাজবংশীদের মধ্যে পার্টির কাজ করতে করতে, রাজবংশী বাচন থেকে।[৬২]

উক্ত বক্তব্যে দেবেশ রায়ের উপভাষা প্রয়োগ বিষয়ক প্রস্তাব ঔপন্যাসিক হিসেবে তার উদ্দেশ্যকেও ব্যাখ্যা করে। *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* উপন্যাসে যদিও কথক স্থানিক নিসর্গ, স্থানিক ভূ-প্রকৃতি-অর্থনীতি-রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ও স্থানিক জনমানুষ কেন্দ্রিক সন্দর্ভ রচনা করেছেন তবু এটাকে 'আঞ্চলিক উপন্যাস' আখ্যা দেওয়া কঠিন। প্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক ভৌগোলিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সূক্ষ্মতায়

যাপিত জীবনধারা সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের সমৃদ্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং তা রূপায়ণে তার মমত্বময় উদ্যোগে উপন্যাসটি বিশিষ্ট হয়েছে। আঞ্চলিক অনুপুঙ্খের তথা অভিজ্ঞতার, অফুরন্ত বিপুল যোগানে সমৃদ্ধ বৃত্তান্তটিকে সাংস্কৃতিক ভাষান্তর বা অনুবাদও বলা চলে। কারণ এতে রয়েছে সাংস্কৃতিক প্রত্যন্তের সযত্ন পরিশ্রমী ও আন্তরিক খোঁজ। বাংলা সাহিত্যের অনেক আঞ্চলিক উপন্যাস থেকে *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* কেন পৃথক, সে প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন:

> এর আখ্যান-ন্যায় বাবদ অন্যান্য অনেক আঞ্চলিক উপন্যাস থেকে পাঠ্যটিকে যে পৃথগীকৃত করে নেওয়া সম্ভব, তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল নিছক আধার হিসেবে বাইরে থেকে দেশকাল পরিধিকে চিহ্নিত করেই আঞ্চলিকতার দায় সেক্ষেত্রে চুকোচ্ছে না, অনেকদূর পর্যন্ত প্রবিষ্ট হয়ে তা সমীকৃত হচ্ছে অন্তর্বস্তুর সঙ্গে; এই অর্থে অধিকরণ বা আধার কেবল নয়, তা আধেয়ও বটে। সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসহ দেশকালপট, অর্থাৎ ইতিহাস ও ভূগোল, উপন্যাসের অন্তর্বস্তুর সঙ্গে একীভূত হচ্ছে। ...আঞ্চলিকতার যুক্তি তৈরি হচ্ছে একই সঙ্গে পাঠ্যের ভিতর ও বাইরে থেকে।[৬৩]

তাছাড়া এই কথকতা প্রায়শই একজন নাগরিক লেখকের, শিক্ষিত-মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক-সামাজিক-নৃতাত্ত্বিক-ভৌগোলিক-সাংস্কৃতিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণে এবং ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ। বাঘারু এই কথকতার কেন্দ্রবিন্দু, তার কোনো ভাষা নেই, কেবল আছে শরীর– তিস্তার শরীরই যেমন তারা ভাষা, বাঘারুর শরীরই তার ভাষা– চেতন-অচেতনের, জীব-জড়ের দ্বিক-সম্পর্কে বাঘারুও তিস্তাকে ধরে রেখে কথক এই দুই প্রকৃতির (নিসর্গ আর মানব) ভাষার সঙ্গে পরিচিত করান পাঠককে। অনিঃশেষ বৃত্তান্তের চলমানতা আর অপরিবর্তনের বাঘারুর পরিচয় দেন ঔপন্যাসিক :

> এই *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* প্রাকৃতিক তিস্তার সঙ্গে মানুষজনের সহবাসের রীতিনীতির বৃত্তান্ত। গয়ানাথের সঙ্গে তিস্তার সহবাসের একরকম রীতিনীতি, নিতাইদের সঙ্গে আর-এক রকম আর সীমান্তবাহিনীর সঙ্গে আরো এক রকম। বাঘারুর রীতিনীতি বলে কিছু নেই। তিস্তা তার নদীস্বভাবে প্রাকৃতিক, সে জল ছাড়া আর কিছু নয়। বাঘারু তার মানবস্বভাবে প্রাকৃতিক– সে কেবল মানুষ, একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়।
>
> এই বৃত্তান্ত লেখা এখানেই শেষ হল। তিস্তা ব্যারেজ আরো কয়েক বছর পর শেষ হবে। তখন সেই নতুন, মানুষের তৈরি নদীর সঙ্গে মানুষজনের সহবাসের রীতিনীতি একেবারে আমূল বদলে যাবে। কত দ্রুত আর কতটাই আর কতটাই আমূল যে তা বদলায়– তা বদলানোর আগে আমরা ধারণাও করতে পারি না, বদলানোর পরও মাপতে পারি না।[৬৪]

বাঘারুও তিস্তার পরিবর্তিত রূপের মধ্য দিয়েই কিংবা মাদারির মা-র স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-পরিচয়ে অথবা তিস্তার বন্যায় সীমান্ত মুছে যাওয়ার মুহূর্তে নাম-দেশ-পরিচয়হীন বৃষ্টিভেজা অসহায় মেয়ের ধর্ষণে এ বৃত্তান্ত ভিন্ন বয়ানে সমর্পিত হয়। এতে তিস্তাপারের জনগোষ্ঠীর বহমান জীবনধারা শিল্পসম্মতভাবে প্রযুক্ত হলেও বৃত্তান্তটি অঞ্চল বা দেশকালের সীমা অতিক্রান্ত হয়ে ওঠে। আর ব্যারেজশোভিত তিস্তা কিংবা প্রশাসনরক্ষিত আপলচাঁদ ফরেস্ট ছেড়ে মাদারির হাত ধরে বাঘারুর নিরর্থক, নিরুদ্দেশ পরিক্রমায় সৃষ্টি হয় মহাকাব্যিকতার সুর। সমালোচকের ভাষায়:

> রূপকথার স্বপ্ন ছেঁড়া অরণ্য স্বদেশ ছেড়ে Diaspora বাঘার চলে যাচ্ছে। পিছনের পথে পড়ে রইল ভাঙা ইতিহাসের টুকরোগুলো। ...
>
> বাঘারু চলে যাচ্ছে।
>
> সে কি আবার ফিরে পেতে চাইবে নতুন কোনো অরণ্য লাবণ্য?
>
> জানে না ইতিহাস...
>
> অথবা নতুন কোনো স্রোতস্বতী জননী প্রবাহিনীকে?

কে জানে...

হাঁটছে বাঘারু...

ভাঙতে ভাঙতে যাচ্ছে কথকের দেওয়া অপমানের অন্ধকার আবরণকে। ছিন্ন করে যাচ্ছে মাটির বঞ্চনা, ভূমি আধিপত্যকে।

হাঁটছে বাঘারু...

চলেছে যেন নেই দেশ, নেই সময়, নেই ঘর, নেই স্বজন, নেই সমাজ, নেই রাষ্ট্র, নেই ইতিহাস, নেই ভূগোলের দেশে।

হাঁটছে বাঘারু নয়...

জীবন...

আবহমানকালের...।[৬৫]

তিস্তা কাহনের রচনাকার এভাবেই ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব আর নৃ-তত্ত্বের নির্যাস নিষ্কাশন করেন। এই সন্দর্ভের সাথে জড়িয়ে আছে মহাকাব্যের মতই জনজাতি গোষ্ঠীর পরিচয়, বংশ-কুলশাস্ত্র কিংবদন্তি, প্রবাদ, প্রত্ন-পুরাণ সর্বোপরি জীবন সমগ্রের চিহ্নায়ন। সময়-সমাজ-রাষ্ট্র ইতিহাসের জালে জড়িয়ে পড়া জীবনকে, এর যাত্রাপথকে সাহিত্যকথায় বর্ণাভ করে কথক এক অন্ত-অনতিক্রম্য বৃত্তান্ত রচনা করেছে।

## টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. অরুণ সেন, 'দেবেশ রায়ের বৃত্তান্ত', কঙ্ক, দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা, স্বপন পাণ্ডা ও উৎপল সাহা সম্পাদিত, (ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৪২১), পৃ.১৮৪

২. উৎস: http://www.google.com/amp/s/literayterms.net/chronicle/amp/

৩. 'Chronicles, the predecessores of modern histories, were written accounts, in prose or verse, of national or worldwide events over a considereble period of time. If the chronicles deal with events year by year, they are often called annals. Unlike the modern historian, most chronicles tended to take their information as they found it, making little attempt to separate fact from legend.' M.H Abrams & Galt Harpham Geoffrey [Edt.] (2015). *A Glossary of Literary Terms* (11th edition). (Published by Wadsworth, Cengage Learning Boston, USA, 2015), p. 51

৪. Chris Baldick[Edt.] *The Oxford Dictionary of Literary Terms* (Fourth edition). (Oxford University Press, United Kingdom. 2015), p. 33

৫. পহেলা বৈশাখ, ১৪২২ উপলক্ষে দেবেশ রায় ঢাকায় আসেন ২০১৫ সালের ১১ এপ্রিল। তিনি অতিথি হয়েছিলেন কথাসাহিত্যিক সালমা বাণীর নিকুঞ্জস্থ বাসায়। গবেষকের (মুনিরা সুলতানা) সাথে দেবেশ রায়ের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার থেকে গৃহীত তথ্য। সাক্ষাৎকারের তারিখ : ১২ এপ্রিল, ২০১৫। স্থান : নিকুঞ্জ, ঢাকা।

৬. দেবেশ রায়, 'কবি–অধ্যাপক মনিরুজ্জামান স্মারক বক্তৃতা ২০১৫', (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ২০১৫), পৃ.২২

৭. গবেষকের (মুনিরা সুলতানা) সাথে দেবেশ রায়ের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার থেকে গৃহীত তথ্য। সাক্ষাৎকারের তারিখ : ১২ এপ্রিল, ২০১৫। স্থান: নিকুঞ্জ, ঢাকা।

৮. দেবেশ রায়, 'কথোপকথন', উদ্ধৃত, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে দেবেশ রায়ের কথোপকথন, *উপন্যাস নিয়ে* (দে'জ পাবলিশিং,কলিকাতা, ১৯৯১), পৃ. ২০১

৯. অরুণ সেন, 'দেবেশ রায়ের বৃত্তান্ত', কঙ্ক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৪-১৮৫

১০. বিমলেন্দু মজুমদার, 'আমার শিক্ষক, অধ্যাপক দেবেশ রায়', কঙ্ক, দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা, স্বপন পাণ্ডা ও উৎপল সাহা সম্পাদিত (ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৪২১), পৃ. ৩৭

১১. দেবেশ রায়, *জলের মিনার জাগাও (আত্মকথা)*, (প্রাচী প্রতীচী, কলকাতা-৭০০০৬১, ২০১৬), পৃ. ১২০

১২. রুশতী সেন, *সমকালের গল্প-উপন্যাসে প্রত্যাখানের ভাষা* (পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯, ১৯৯৭), পৃ. ২৬
১৩. দেবেশ রায়, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* (দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৮৮), পৃ. ৩৮
১৪. তদেব, পৃ. ৩৯
১৫. তদেব, পৃ. ৪০
১৬. শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসে 'ওরা'* (প্যাপিরাস, কলকাতা- ৭০০ ০০৪, ১৯৯৬), পৃ. ১০৬
১৭. দেবেশ রায়, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১
১৮. তদেব, পৃ. ৬৯
১৯. তদেব, পৃ. ৮৯
২০. তদেব, পৃ. ৯৪
২১. তদেব, পৃ. ৯৪
২২. তদেব, পৃ. ৯৭
২৩. তদেব, পৃ. ৯৪
২৪. তদেব, পৃ. ১০৯
২৫. তদেব, পৃ. ১২৩
২৬. বেগম আকতার কামাল, 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত : নদী-অন্বিত শরীর, ব্যক্তি ও ইতিহাস', *মহাবিদ্রোহের আখ্যানতত্ত্ব ও কথাশিল্প* (ধ্রুবপদ, ঢাকা, ২০১০), পৃ. ৬৯
২৭. দেবেশ রায়, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬
২৮. তদেব, পৃ. ১২৩
২৯. তদেব, পৃ. ১২৭
৩০. তদেব, পৃ. ১২৮
৩১. শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসে 'ওরা'*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮
৩২. দেবেশ রায়, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯
৩৩. তদেব, পৃ. ১৬৭
৩৪. তদেব, পৃ. ১৩৩-১৩৪
৩৫. অনিন্দ্য ভট্টাচার্য, *কথা গঠন* (সুজন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২), পৃ. ১৪১
৩৬. রুশতী সেন, *সমকালের গল্প-উপন্যাসে প্রত্যাখানের ভাষা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২
৩৭. দেবেশ রায়, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮-১৮৯
৩৮. তদেব, পৃ. ৩২৭
৩৯. তদেব, পৃ. ২৯০
৪০. তদেব, পৃ. ৩৪৭
৪১. শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসে 'ওরা'*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭
৪২. দেবেশ রায়, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৮-৪২৯
৪৩. তদেব, পৃ. ৩৪৪
৪৪. শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসে 'ওরা'*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮
৪৫. দেবেশ রায়, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৯
৪৬. শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসে 'ওরা'*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫
৪৭. প্রিয়কান্ত নাথ, *কাল-বিভাজিত বাংলা উপন্যাস* (বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা : ৭০০০০৯, ২০০৭), পৃ. ৮৯
৪৮. নাসিম মহিউদ্দিন, *প্রসঙ্গ : কথাসাহিত্য* (কাগজ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩), পৃ. ১৩৯
৪৯. দেবেশ রায়, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৩
৫০. তদেব, পৃ. ৪৩৫
৫১. তদেব, পৃ. ৪৩৫
৫২. বেগম আকতার কামাল, 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত : নদী-অন্বিত শরীর, ব্যক্তি ও ইতিহাস', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬-৭৭
৫৩. দেবেশ রায়, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯১
৫৪. অরুণ সেন, 'দেবেশ রায়ের বৃত্তান্ত', কঙ্ক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯
৫৫. সাধন চট্টোপধ্যায়, 'ক্ষমতা, বচন : নিম্নবর্গীয় চেতনার প্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক বাংলা আখ্যান', *বাংলা আখ্যান : বহুমাত্রিক পাঠ*, বেলাদাস ও বিশ্বতোষ চৌধুরী সম্পাদিত (রত্নাবলী, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০১১), পৃ. ১১৯
৫৬. বেগম আকতার কামাল, 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত : নদী-অন্বিত শরীর, ব্যক্তি ও ইতিহাস',পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২
৫৭. অরুণ সেন, 'দেবেশ রায়ের বৃত্তান্ত', কঙ্ক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩
৫৮. তপোধীর ভট্টাচার্য, *কথার সময় : সময়ের কথা* (বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা : ৭০০০০৯, ১৪২০), পৃ. ২৭

৫৯. অনিন্দ্য ভট্টাচার্য, *কথা গঠন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২
৬০. তদেব, পৃ. ১৪৪
৬১. মনোরঞ্জন বিশ্বাস, 'এক অশ্বারোহী ও নিঃসঙ্গ শব্দ', কঙ্ক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৩
৬২. দেবেশ রায়, *উপন্যাস নিয়ে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫-১৯৬
৬৩. অনিরুদ্ধ লাহিড়ী, 'অপরের খোঁজে বাংলা উপন্যাস: *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*', কঙ্ক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২
৬৪. দেবেশ রায়, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৫
৬৫. মনোরঞ্জন বিশ্বাস, 'এক অশ্বারোহী ও নিঃসঙ্গ শব্দ', কঙ্ক,পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯